



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 90 - 97

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ভক্তির আলোকে কৃষ্ণ : ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সাহিত্যিক রূপায়ণ

ইন্দ্রাণী মাল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: mailto:indrani10@gmail.com

 0009-0004-2965-7433

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Lord Krishna,
Aishwarya,
Madhurya, Bhakti,
Vaishnava
Padavali,
Vrindavan, Divine
Love, Human
Character, Bengali
Literature,
Supreme God.

Abstract

This article discusses the two beautiful sides of Lord Krishna's character: Aishwarya and Madhurya. In Indian philosophy and Vaishnava tradition, Krishna is seen as the source of all happiness and divine emotions. He shows Himself to His devotees in different ways. Sometimes He is the all-powerful God, and sometimes He is a simple, loving person.

The first part of the article explains Aishwarya. This is Krishna's royal and divine power. In great books like the Mahabharata and the Bhagavad Gita, we see Krishna as the supreme creator and the protector of the world. He destroys evil and establishes truth. This form of Krishna is very grand and fills our hearts with respect, fear, and wonder. It reminds us that He is the master of the entire universe.

The second part focuses on Madhurya, which means sweetness. This is the heart of Vaishnava literature, especially in Bengal. In this form, Krishna forgets His power and becomes a simple human being. In the forests of Vrindavan, He is a playful child, a dear friend to the cowherd boys, or a deep lover of Radha. Here, His beauty and the music of His flute are more important than His strength. Famous poets like Jayadeva, Vidyapati, and Chandidas have written beautiful songs (Padavali) about this sweet side of Krishna. They show us that Krishna is not a distant God but someone very close to our hearts. The article also explains that although Krishna is God, He chooses to be bound by the love of His devotees. For example, when Mother Yashoda tries to tie Him with a rope, He allows Himself to be caught only because of her motherly love. This shows that love is greater than power.

In conclusion, the article highlights that while Aishwarya tells us that Krishna is the Almighty God, Madhurya shows us that He is our dearest friend. This sweet and human side of Krishna has inspired Bengali literature for hundreds of years. It teaches us that pure, selfless love is the best way to reach the Divine. Through Bhakti (devotion), the King of the universe becomes a simple person for His devotees.

Discussion

সনাতন ধর্ম ও দর্শনের এক রহস্যময় ও আনন্দময় আধার হলেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অখিল রসামৃত সিন্ধু, অর্থাৎ সমস্ত রসের মূল উৎস। ভক্তের আকুলতা এবং সাধনার ধরন অনুযায়ী তিনি নিজেকে নানাভাবে ভক্তের কাছে ধরা দেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকাশ তিন স্তরের— পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণ। গোকুল-বৃন্দাবনের লীলাভূমিতে তিনি ‘পূর্ণতম’, মথুরায় ‘পূর্ণতর’ এবং দ্বারকায় তিনি ‘পূর্ণ’। তবে কৃষ্ণকথার সুবিশাল প্রাঙ্গণে তাঁর যে দুটি প্রধান স্বরূপ আমাদের বারবার মোহিত করে, তা হল তাঁর ঐশ্বর্য রূপ এবং মাধুর্য রূপ।

আকাশের অসীমতা যেমন একটি মাটির প্রদীপের শিখায় ধরা দিতে চায়, কিংবা সমুদ্রের বিশালতা যেমন একটি জলবিন্দুর মায়ায় বিলীন হতে চায়— ঠিক তেমন এক পরম বিস্ময়ের নাম শ্রীকৃষ্ণ। ভারতীয় দর্শনের আঙিনায় তিনি কেবল একজন দেবতা নন, বরং তিনি একটি অনন্ত অনুভূতির নাম। কখনও তিনি কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে রথের চাকা হাতে এক ভয়ংকর সংহারক, আবার কখনও তিনি বৃন্দাবনের কদমতলায় একলা বাঁশি হাতে বিরহী প্রেমিক। একদিকে তাঁর ‘ঐশ্বর্য’ — যা আমাদের নতজানু করে শঙ্কায়, অন্যদিকে তাঁর ‘মাধুর্য’ — যা আমাদের হৃদয়ে দোলা দেয় নিবিড় ভালোবাসায়। মহাকাব্য থেকে শুরু করে বৈষ্ণব পদাবলীর দীর্ঘ পথপরিক্রমায় কৃষ্ণের এই দুই সত্তা কখনও সমান্তরালভাবে চলেছে, আবার কখনও একে অপরকে ছাপিয়ে গেছে। এই প্রবন্ধে আমরা অন্বেষণ করব কীভাবে তাঁর সেই রাজকীয় দাপট আর মানবিক স্নিগ্ধতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে এবং কেন বৈষ্ণব কবিদের কাছে তাঁর ‘ঐশ্বর্য’ সত্তার চেয়ে ‘মানুষ’ সত্তাই শেষ পর্যন্ত বেশি সত্য হয়ে উঠেছে।

ঐশ্বর্য : অনন্তের গাভীর : ভগবানের ঐশ্বর্য রূপটি হল তাঁর সেই রাজকীয় বিভূতি, যা দিয়ে তিনি ব্রহ্মাণ্ড শাসন করেন। এটি তাঁর শক্তির সেই দিক যা অধর্মকে নাশ করে এবং জগতকে রক্ষা করে। অর্থাৎ দুষ্টির দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্ম স্থাপনের জন্য ভগবানের বিশেষ অংশরূপে যে প্রকাশ, সেটা হচ্ছে অবতার। আর ভক্তের আনন্দ বিধানের জন্য আনন্দের উচ্ছ্বাসে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকাশ, তাকে বলে লীলা। এই দুই রকম প্রকাশ তাঁর স্বরূপের দুইটি বিশিষ্ট দিক - ঐশ্বর্য ও মাধুর্যেরই অভিব্যক্তি। শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে –

“শ্রীকৃষ্ণের যে প্রভাবে ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি অভিমাত্রী দেবগণের অভিমান চূর্ণ হইয়া যায়, সেই প্রভাবের নাম ঐশ্বর্য।”^১

যে রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বেদের উদ্ধারকর্তা, অতি বিশাল পৃথিবীর সংস্থাপক, ত্রিভুবনের আচ্ছাদক, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দৈত্যের সংহারক সেটাই তাঁর ঐশ্বর্য রূপ। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মের স্তবরাজ কিংবা গীতার বিশ্বরূপ অধ্যায়ে এই ঐশ্বর্যের চরম শিখর আমরা প্রত্যক্ষ করি। সেখানে তিনি আদি-মধ্য-অন্তহীন এক মহামূর্তি, যাঁর নিশ্বাসে চরাচর কম্পিত হয়। এই রূপ ভক্তের মনে সন্ত্রস্ত জাগায়, ঐশ্বর্যকে ধরাছোঁয়ার বাইরের এক অধীশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

মাধুর্য : প্রেমের স্নিগ্ধ রূপ : কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কেবল ধরাছোঁয়ার বাইরের ঐশ্বর্য হয়েই থাকেননি। তিনি নেমে এসেছেন ব্রজের ধূলিধূসরিত পথে। তাঁর এই রূপটিই হল ‘মাধুর্য’। অর্থাৎ যে মূর্তিতে তিনি সুন্দর, মধুরভাষী, করুণ, ভক্ত বৎসল, প্রেমের বশীভূত, মঙ্গলময় সেটাই হচ্ছে তাঁর মাধুর্য রূপ। এই মাধুর্যের স্বরূপ বিচিত্র - তার মধ্যে লীলা মাধুর্য, প্রেম মাধুর্য, বংশী মাধুর্য ও রূপ মাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণ অসাধারণ। শ্রীরূপ গোস্বামীর মতে, সর্ব অবস্থায় যে চারুতা বা মনোহারিত্ব আমাদের প্রাণ হরণ করে, তাই মাধুর্য। মাধুর্য রূপে তিনি সুন্দর, ক্ষমাশীল এবং প্রেমের কাঙাল। এখানে তিনি কারও পুত্র, কারও সখা, আবার কারও কান্ত। এই মাধুর্যের শক্তি এমনই অতল যে, এখানে ভক্ত ও ভগবান এক নিবিড় মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হন। এখানে ঐশ্বর্যের চেয়ে মানবিকতা বড় হয়ে ওঠে। বৃন্দাবনের ধূলিকণায় যখন তিনি গোপবালকদের সাথে ক্রীড়া করেন বা যমুনার তীরে বাঁশি বাজান, তখন তাঁর ঐশ্বরিক তেজ ঢাকা পড়ে যায় এক স্নিগ্ধ মায়ায়। অর্থাৎ, মাধুর্য রূপই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণ। বৃন্দাবনের রাখাল কৃষ্ণ— যিনি বাঁশি বাজান, গোপীদের সঙ্গে লীলা করেন, রাখার প্রেমে আবিষ্ট— এই রূপে কৃষ্ণ ঐশ্বর্য নন, বরং প্রেমের মানুষ। এই মানবীয় কৃষ্ণই বৈষ্ণব কবিদের কাব্যচিত্তার কেন্দ্রবিন্দু। বিদ্যাপতির পদে

কৃষ্ণ প্রেমিক— যিনি রাধার বিরহে কাতর। চণ্ডীদাসের পদে কৃষ্ণ কখনো অভিমানী, কখনো আকুল প্রেমাস্পদ। এখানে ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণরূপে আবৃত, মাধুর্যই মুখ্য। ভক্ত এখানে ঈশ্বরের দাস নয়, বরং প্রেমের অংশীদার।

ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের একীভূত লীলা : পুরাণ ও কাব্য সাহিত্যে এই দুই রূপের এক অদ্ভুত লুকোচুরি আমরা দেখতে পাই। যদিও প্রাচীন কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবই প্রধান ভাবে ফুটে উঠেছে। এর অন্যতম কারণ হল - প্রথম স্তরের কৃষ্ণলীলায় মেয়েলি গাথা বা ব্রতকথার প্রভাব বিশেষ পড়েনি। এ কথার অন্যতম প্রমাণ হল, প্রাচীন শিল্পে বিভিন্ন মন্দির গাত্রে বা পর্বত গাত্রে খোদিত শিল্পে যে কৃষ্ণলীলার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে কৃষ্ণের বীর ভাবটিই বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। রবি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মতে -

“পাহাড়পুরের শিলা চিত্রের মধ্যে কৃষ্ণের যমলার্জুন ভঙ্গ দাক্ষিণাত্যের মহাবলীপুরমে কৃষ্ণের গোবর্ধন ধারণের বিরাট চিত্র, খাজুরাহোর মন্দির গাত্রে কৃষ্ণের পুতনাবধ চিত্র, তৃণাবর্ত বধ, যমলার্জুন ভঙ্গ প্রভৃতি চিত্রের মধ্যে কৃষ্ণের বীরভাবটিই ব্যক্ত হয়েছে। এইসব চিত্র অতি পুরাতন। তাই অনুমান করা যেতে পারে, কৃষ্ণ লীলার প্রাচীন রূপে কি শিল্পে কি সাহিত্যে - কৃষ্ণের বীরভাব তথা ঐশ্বর্য ভাবই প্রধান।”^২

পুরাণের আধ্যাত্মিকতা বা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ভাব এ যুগের কাব্য কবিতায় বিশেষ অনুসৃত হয়নি। মালাধর বসু প্রথম পুরাণের বিষয় ও ভাব নির্যাস গ্রহণ করেন। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতি প্রধান প্রধান কৃষ্ণ কথার আকর গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণের ভগবত সত্তা তথা ঐশ্বর্য রূপের বিকাশ ঘটেছে। মহাভারত এবং ভাগবতে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণের জীবনকে দেখা হয়েছে। মহাভারতে তিনি মূলত পাণ্ডবদের হিতৈষী রাজনীতিবিদ। তাই তাঁর জীবনের যে সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরু-পাণ্ডবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় - তা মহাভারতে নেই। অর্থাৎ মহাভারতে কৃষ্ণ প্রধানত রাজনীতিবিদ এবং পাণ্ডবদের মন্ত্রণাদাতা। সেখানে তাঁর ঐশ্বর্যই বেশি প্রকাশিত। কিন্তু ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণের মতো ধর্মগ্রন্থগুলোতে এই দুই রূপের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়।

“ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দুইটি ভিন্ন বৃত্তি হইলেও এই উভয়ই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির বৃত্তি। সুতরাং তাহাতে এই দুই বৃত্তিরই যে প্রকাশ থাকিবে তাহাই স্বাভাবিক।”^৩

মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মের স্তবরাজ ও কালিয়নাগ দমনকালে নাগপত্নীদের স্তব এটারই উদাহরণ। ভীষ্মের স্তবে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া রূপের বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই যে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে ক্রীড়ার উল্লেখ থাকলেও কংসবধই সেই ক্রীড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপের সঙ্গে মাধুর্য রূপ লক্ষিত হয়েছে। আবার ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রূপের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই কালিয়দমন লীলায়। কারণ -

“কালিয় দমনের পরে নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার পদধূলির জন্য তপস্যা করেন, কালিয়নাগ তাহার অশেষ পুণ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই পদধূলির স্পর্শ পাইয়াছে। তাই কালিয়নাগের দমন তাহাদের নিকট নিগ্রহ নহে পরম অনুগ্রহ বলিয়াই মনে হইয়াছে।”^৪

দুষ্কৃতির প্রতি এই করুণার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যময় হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির এই বৃত্তি দুইটির প্রকাশ সর্বত্র প্রায় একই সঙ্গে দেখা গিয়েছে।

সাধারণভাবে মথুরা ও দ্বারকালীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য এবং ব্রজলীলায় তাঁর মাধুর্য রূপের সমধিক প্রকাশ। মথুরা ও দ্বারকালীলায় তিনি সর্বশক্তিমান ভগবান, দন্দদাতা, দুষ্টির দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যই তাঁর আবির্ভাব। কংস ও শিশুপাল বধ প্রভৃতি লীলায় প্রধানত তাঁর এই ঐশ্বর্যেরই প্রকাশ। আর ব্রজলীলায় তিনি প্রিয় জগদ্বন্ধু, করুণাসিকু, সবসময়

ভক্তের অনুগ্রহে তৎপর ও সুন্দর। ব্রজবাসীগণের মধ্যে কাউকে বাৎসল্য, কাউকে সখ্যের, কাউকে দাস্যে এবং কাউকে বা মধুর রসে ভাবিত করে তিনি নিত্যই লীলারত।

এর অর্থ এই নয় যে, মথুরা ও দ্বারকায় কেবল ঐশ্বর্য রূপ আর ব্রজে কেবল মাধুর্যরূপ ধরা দিয়েছে। কারণ মথুরা ও দ্বারকায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর - এই চার ভাবের ও চার প্রকারের দৃষ্টান্ত আছে। যেমন অর্জুনের সঙ্গে সখ্যভাবে, বসুদেব-দেবকীর সঙ্গে বাৎসল্য ভাবের এবং রুক্মিণীর সঙ্গে মধুর ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি আবার ব্রজলীলাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুতনাবধ, কালিয়দমন, গোবর্ধন ধারণ প্রভৃতি ঘটনাতে তাঁর ঐশ্বর্য রূপের প্রকাশ পায়। ঐশ্বর্য ও মাধুর্য যখন তাঁর স্বরূপ শক্তিরই বৃত্তি বিশেষ, তখন এই দুইটির অবিমিশ্র প্রকাশ সম্ভব নয়। ঐশ্বর্য রূপে মাধুর্য এবং মাধুর্য রূপে ঐশ্বর্যের স্ফূরণ থাকবেই। পুতনাবধ, কালিয়দমন প্রভৃতি ঐশ্বর্য প্রধান লীলায় যেমন ঐশ্বর্যের সঙ্গে মাধুর্যের প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি আবার রঞ্জুবন্ধন ও রাসলীলার মতো মাধুর্যপ্রধান লীলাতেও তাঁর ঐশ্বর্য রূপের প্রকাশ দেখা যায়। মহাভারতের কৃষ্ণ, নারায়ণ ও বিষ্ণুর সাথে অভিন্ন হলেও তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্তা ঐশ্বর্যময় পুরুষ। আর অন্যদিকে ভগবতের কৃষ্ণ ভক্তবৎসল ভগবান, প্রেমের দেবতা। সত্যবতী গিরি মহাশয়ার মতে -

“দ্বি-পার্বিক কৃষ্ণলীলা কথার আর এক পর্ব হল ব্রজলীলা কথা অর্থাৎ কৃষ্ণের বাল্যজীবন কাহিনি। দ্বারকা পর্বে এবং মহাভারতে কুরুক্ষেত্র লীলায় শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্তা। তাই অনেকে মহাভারত ও গীতার এই শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। কিন্তু এই রূপ তাঁর কেবলমাত্র ঐশ্বর্য রূপ। অন্যদিকে বাল্যলীলায় একাধারে মিশ্রিত রয়েছে ঐশ্বর্য ও মধুর রস। পুরাণ সমূহের মধ্যে এই ব্রজলীলা কথার পূর্ণ লিপিচিত্র পাওয়া যায়।”^৬

মথুরা, দ্বারকা ও ব্রজের আরও কয়েকটি লীলা আলোচনা করলে আমরা বুঝতে পারবো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একইসঙ্গে ঐশ্বর্য রূপ এবং মাধুর্য রূপ নিয়ে প্রকটিত হয়েছেন। যেমন - অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, মিত্রোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তার রথের সারথি। এই সুহৃদ অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। এটা দেখে অর্জুনের সখ্যভাবে হারিয়েছিল, সখ্য বুদ্ধি ত্যাগ করে গৌরব বুদ্ধিতে পরমেশ্বর জ্ঞানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করে পূর্বের সখ্য মূলক আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। আবার কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যাত্মক চতুর্ভুজ রূপ দেখে দেবকী এবং বসুদেবের বাৎসল্য সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং তারা নবজাতক শিশুর স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

কিন্তু ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপ দেখে ব্রজবাসীদের মনে কখনও এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। ব্রজলীলার সহচরণ অঘাসুর-বকাসুর বধ ও দাবানল ভক্ষণ প্রভৃতি লীলায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের বিকাশ দেখেছেন অথচ অর্জুনের মতো তাঁদের সখ্য ভাব তিরোহিত হয়নি। তাঁর কাঁধে আরোহণের ধৃষ্টতা জনিত অপরাধের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করেনি বরং তাঁর কাঁধে আবার আরোহণের দাবি জানিয়েছেন। আবার মাটি ভক্ষণ লীলায় মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে তাঁর ঐশ্বর্য ভাবের উদয় হয়েছিল বটে কিন্তু এই জ্ঞান ক্ষণিকের। পর মুহূর্তেই তিনি ঐশ্বর্যশক্তির কথা ভুলে স্নেহে পুত্রকে কোলে তুলে নেন। এইভাবে ব্রজের প্রত্যেক লীলাতেই ঐশ্বর্য রূপ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কারও ভাব বা প্রীতি সঙ্কুচিত হয়নি বরং তা আরও পরিপুষ্টিই লাভ করেছে। এটাই ব্রজের ঐশ্বর্যের বিশেষত্ব, এটাই ব্রজের ঐশ্বর্যের মাধুর্য। এখানেই মথুরা দ্বারকার ঐশ্বর্যের সঙ্গে ব্রজের ঐশ্বর্যের পার্থক্য।

তবে এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য উভয় রূপেই তিনি করুণাময়। কারণ, লীলা যেমন তাঁর স্বরূপ শক্তির বৃত্তি, করুণাও তেমনি তাঁর স্বরূপ শক্তির বিলাস। যেখানে স্বরূপশক্তির বিকাশ, সেখানে করুণারও প্রকাশ। মাধুর্য রূপে ভগবানের করুণা যে প্রকাশ পাবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঐশ্বর্য লীলায়ও তাঁর করুণার অভিব্যক্তি বিরল নয়। কংস, শিশুপাল প্রভৃতি দুরাত্মাদের বধ করে তিনি তাদের মুক্তি দিয়েছেন এবং তার মধ্যে দিয়েই তাঁর করুণা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ উভয় লীলাতেই তিনি করুণার মূর্ত প্রতীক।

পদাবলীতে মাধুর্যের জয়গান : বাংলা সাহিত্যের পদাবলী অংশে কৃষ্ণের মাধুর্য রূপটিই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বা জয়দেবের গীতগোবিন্দে কৃষ্ণকে আমরা রক্ত-মাংসের আবেগপ্রবণ এক প্রেমিকের রূপে পাই। বড়

চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কিংবা জ্ঞানদাস— সব কবিই কৃষ্ণের ওপর দেবত্বের আবরণ সরিয়ে তাঁকে ধরণীর ধুলোবালিতে নামিয়ে এনেছেন। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ যেখানে রাজকীয় ও কামকলায় বিদগ্ধ, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ সেখানে গভীর অনুরাগী ও বিরহী। অর্থাৎ, করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য - দুই রূপের প্রকাশ থাকলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধুর্যকেই শ্রেষ্ঠ এবং ভাগবতের সার বা প্রাণ বলে মনে করেছেন। সেই জন্য বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা কৃষ্ণের মাধুর্য রূপের প্রকাশ বেশি দেখতে পাই। সত্যবতী গিরি মহাশয়ার মতে -

“ভাগবতে ঐশ্বর্যের পাশাপাশি ব্রজলীলার স্নিগ্ধ মাধুর্য, পিতা মাতা ও বন্ধু পরিজনের পারস্পরিক সম্পর্কের অকৃত্রিমতা ভক্তি রসার্ধ হয়ে মধুর ভাবে ফুটে উঠেছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও পদ্মপুরাণ এই একই পথে যাত্রা করেছে এবং বিশ্বাস করেছে ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্’। রাধা কৃষ্ণ প্রেমলীলা ও গোপী লীলার পরিপূর্ণ স্ক্ররণ ঘটেছে এই পুরাণ গুলির মধ্যে। আর তারই ধারা পথ বেয়ে বাংলা সাহিত্যে এসেছে বৈষ্ণব ধর্মাভিষিক্ত কৃষ্ণকথার রসপ্লাবন।”^৬

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের ঐশ্বর্য রূপ অপেক্ষা মাধুর্যক রূপকে যে শ্রেয় বলে মনে করেন, তা কতটা যুক্তিযুক্ত এখন সেটা বিচার করে দেখা যাক। ঐশ্বর্যমূলক ক্ষমতাতির দ্বারা অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করা যায় সত্য কিন্তু সেই আধিপত্য দেহের উপরেই সম্ভব, মনের উপর নয়। তবে করুণা ও মাধুর্য দেহ ও মন উভয়কেই বশীভূত করতে পারে। সুতরাং এই দিক দিয়ে বিচার করলে ঐশ্বর্যের শক্তি পরিমিত, মাধুর্যের শক্তি সর্বাঙ্গিক। আবার মাধুর্যের এমন শক্তি যে, তার উপস্থিতিতে ঐশ্বর্য সঙ্কুচিত ও পরাজিত হয়। এটার প্রমাণ দামবন্ধন লীলায় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য শক্তির প্রত্যয়ে প্রতিবারই দুই আঙুলের মতো দড়ি কম হওয়ায় যশোদার পুত্রকে বন্ধনের চেষ্টা ব্যর্থ হতে লাগল - তিনি শান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। মায়ের ক্লান্তি দেখে শ্রীকৃষ্ণের মনে দুঃখ ও আক্ষেপের সঞ্চার হতেই মাধুর্য শক্তির আবির্ভাবে ঐশ্বর্যরূপ দূর হল, মায়ের হাতে পুত্র বাঁধা পড়লেন।

“যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহার মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার নামই ভালোবাসা।”^৭

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের যে বিচিত্র লীলা জয়দেব থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন কবির সৃষ্টিতে রূপায়িত হয়েছে, তা মানবিক প্রেমেরই সূক্ষ্মতীক্ষ্ম স্তরকে তুলে ধরেছে। জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’-এ তাঁর আশ্রয় গোপ লীলা। যদিও গীতগোবিন্দের প্রথমে তিনি বিষ্ণুর দশাবতার স্তোত্র লিপিবদ্ধ করেছেন, তবুও তাঁর কাব্যে বিষ্ণু মুখ্য নয়, কৃষ্ণই মুখ্য। অর্থাৎ, জয়দেবের গীতগোবিন্দে কৃষ্ণের বা বিষ্ণুর ঐশ্বর্য ভাবের পরিচয় দশাবতার স্তোত্রের মধ্যে থাকলেও, কাব্যের পরবর্তী অংশে সে ভাব ফিকে হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কৃষ্ণের মাধুর্য রূপের প্রকাশ পেয়েছে।

“জয়দেব পুরাণকে বিশেষ অবলম্বন করেননি, অবলম্বন করেছেন আদিরসাত্মক রাধাকৃষ্ণ কাহিনীকে। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণ প্রাকৃত প্রেমের নায়ক তুল্য। তাই গীতগোবিন্দে বর্ণিত কৃষ্ণলীলাকে তত্ত্ব হিসাবে না দেখে সাধারণ নায়ক নায়িকার প্রেমলীলা হিসাবে আত্মদান করাই ভাল।”^৮

বৈষ্ণব সাহিত্য কৃষ্ণের লীলা রসেরই গীতিকাব্য। বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণবশাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তা সত্ত্বেও কবিরা শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক বা ঐশ্বরিক রূপ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেননি। তাঁরা নিজেদের কাব্যানুভূতি প্রকাশে কৃষ্ণের মাধুর্যময় রূপটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কৃষ্ণের যে লীলা প্রেমের লীলা, যে লীলায় আনন্দ আছে বৈষ্ণব কবিরা তাকেই ভাব প্রকাশের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। শ্রীমন্ত কুমার জানা তাঁর ‘বৈষ্ণব সাহিত্য সমীক্ষা’ গ্রন্থে জানিয়েছেন—

“প্রেম ও আনন্দের মধ্যে চিরন্তনত্ব রয়েছে এবং এটি সর্বজন গ্রাহ্য। তাই বৈষ্ণব কবিরা শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলাময় মাধুর্যময় রূপটিকে হৃদয়ের সমস্ত আকৃতি উজাড় করে দিয়ে প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। জগতের সমস্ত রূপ সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমের অধীশ্বর তিনি। তাঁর সেই অপূর্ব রূপের কান্তি বর্ণনা

করা যায় না। তিনি নবদূর্বাদল শ্যাম, ‘সুধা জানিয়া কেবা ও সুধা এনেছে গো, তেমনি শ্যামের চিকণ দেহা।’ বৈষ্ণব কবির সাধ্যমত কৃষ্ণের সেই লীলাময় রূপের প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।”^{১৬}

বৈষ্ণব কবির কৃষ্ণের পরমব্রহ্ম স্বরূপকে স্বীকার করে তাঁকে ধরণীর ধূলিতে নামিয়ে একান্ত আপন করে নিয়েছেন। কৃষ্ণের আনন্দ বেদনা মিলন বিরহের মধ্যে মর্ত্য জীবনের আর্তি ফুটে উঠেছে। দ্বারকার রাজ সিংহাসন থেকে কৃষ্ণকে আমাদের পরিচিত কুটির প্রাঙ্গণে নামিয়ে এনেছেন। বাঙালি পদকর্তাদের রচনায় কৃষ্ণ আপন পরিচিত প্রেমিক মানুষ হয়ে উঠেছেন। বৈষ্ণবাচার্যগণ ঈশ্বরের মাধুর্যের পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করেন কৃষ্ণের মধ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজও ব্রজের লীলাকে অর্থাৎ মাধুর্য রূপকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

আবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চন্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণ প্রেম প্রসঙ্গ গোটা কৃষ্ণ কথার ধারায় কিছুটা অভিনবত্বের দাবি করতে পারে। এখানে কৃষ্ণের সমস্ত দৈবী ঐশ্বরিক মহিমা ও প্রেমিক নায়কের কোমলতাকে বর্জন করে কবি কৃষ্ণকে অমার্জিত দেহ-লোলুপ গ্রাম্য বর্বর একটি যুবক হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এই কৃষ্ণের মধ্যে প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতিহীন দেহ কামনাই প্রবল।

কৃষ্ণের বর্ণনায় মধুরং, মধুরং বলে বিভোর হয়েছেন বৈষ্ণব পদকাররা। মধুর রসের লীলা বলে রাধা কৃষ্ণের লীলাকে বলা হয়েছে প্রেমলীলা। বৈষ্ণব দর্শনে ‘প্রেম’ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৈষ্ণব প্রেমের সঙ্গে জাগতিক নরনারীর প্রেমের তুলনা চলে না। কারণ, কামনাতুর নরনারীর প্রেম বা প্রণয়ে থাকে কামনা বাসনার মালিন্য। তার সঙ্গে জড়িত থাকে আত্মপ্রীতি। কিন্তু রাধা কৃষ্ণের প্রেম নিষ্কলুষ কাম গন্ধহীন। অর্থাৎ এই প্রেমের মাধ্যমে কৃষ্ণের মাধুর্য স্বরূপটা বেশি প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছাকে ভক্তি বলাই সঙ্গত। কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে প্রেম, তা হল ভক্তি। অনন্তের প্রতি জীবের ভক্তি, পূর্ণের প্রতি অপূর্ণের ভক্তি। বৈষ্ণব পদে প্রেম ও ভক্তি সমার্থক। ভক্তিতে কামনা থাকে না, থাকে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের আকুলতা। নর-নারীর প্রেমে এমন নিঃশর্ত আত্মবিসর্জন অভাবনীয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণের মাধুর্য স্বরূপ এবং জীবতত্ত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে বৈষ্ণব কবিদের সূক্ষ্ম প্রতিভার দ্বারা। কিন্তু সমগ্র বৈষ্ণব তত্ত্বেরই ভিত্তি হল মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেবের দিব্য জীবন। কৃষ্ণ সম্পর্কে যাবতীয় তত্ত্ব গড়ে উঠেছে চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন প্রত্যক্ষ করে। বৈষ্ণবদের বিশ্বাস মহাপ্রভুই ছিলেন স্বয়ং কৃষ্ণের অবতার। অতএব, বৈষ্ণব দর্শনে গৌড় তত্ত্বটি বেশ মূল্যবান। মহাপ্রভু চৈতন্যই নিজের দিব্য লীলার মাধ্যমে বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর লীলা প্রত্যক্ষ করেই তান্ত্রিকরা পরমাত্মার মাধুর্য স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন।

বৈষ্ণব পদকারগণ বৈষ্ণব ভক্ত হলেও স্বভাবত তাঁরা ছিলেন কবি। তাই ধর্মতত্ত্ব বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন রসপূর্ণ পদ সৃষ্টির মাধ্যমে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বৈষ্ণব পদাবলী তত্ত্বাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও অসামান্য কবি প্রতিভার গুণে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তাই পদাবলীর রসমূল্য নিতান্ত কম নয়। আধুনিক যুগের গীতিকবিতা নরনারীর প্রেমে আবেগ সৌন্দর্যের প্রকাশে যে রূপ দক্ষতা দেখিয়ে থাকেন, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদকারগণ কৃষ্ণের মাধুর্য স্বরূপ প্রকাশে সেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিদ্যাপতির কৃষ্ণ সৌন্দর্য রসিক ও কামকলায় বিদগ্ধনায়ক, কিন্তু মুগ্ধতা, কৌতূহলী ভালোবাসা আর তীব্র মিলনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি দেহ মনে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা মানবীর জন্য সহিষ্ণু আগ্রহে অপেক্ষমান।

“বিদ্যাপতির পূর্বরাগ ও অনুরাগ পর্যায়ে পদে রাধা কৃষ্ণের প্রেম অভিজাত রাজ পুরুষদের দেহ কেন্দ্রিক প্রেমেরই রূপায়ণ, তাই এখানে অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়েছে সৌন্দর্য পিপাসা। কিন্তু বিরহ পর্যায়ে বিদ্যাপতি রাধার কৃষ্ণপ্রেম শেষ পর্যন্ত দেহ নির্ভরতাকে অতিক্রম করেছে। এমনকি, অল্প কিছু পদে হলেও বিদ্যাপতির কৃষ্ণও সেই একই অগভীরতায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।”^{১৭}

পদাবলীকার চন্ডীদাসের পদে প্রেমই সর্বস্ব, সমাজ সংসার আর জীবনের কলরব তাঁর কাছে মিথ্যা। সত্য কেবল হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব। মধ্যযুগের রোমান্টিক কবি জ্ঞানদাসের পদে কৃষ্ণের যৌবনের রহস্যময় অরণ্যে রাধার মন হারিয়ে যায় –

“কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর

রহই না পারই গেহে।

গুরু দরুজন ভয় কিছু নাহি মানয়ে

চীর নাহি সম্বরু দেহে।^{১১১}

একই রকম ভাবে রাধা প্রেমে আত্মহারা কৃষ্ণও প্রেমের গভীর মুগ্ধতায় রাধার নাম উচ্চারণ করেন। জ্ঞানদাসের কৃষ্ণ সখা সুবলের কাছে প্রেমিকা রাধার মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রী রাধার নামের মহিমা বলেন। এই রসতত্ত্বের পূর্ণ প্রতিফলন আরও ভালোভাবে দেখা যায় গোবিন্দ দাসের পদে। গোবিন্দ দাসের কৃষ্ণ বলেন রাধা তাঁর ‘মন দুঃখ মোচনী নয়নের তারা’ তিনি রাধা নামকেই বীজমন্ত্র করে জপ করেন। রাধা যখন একা যমুনার ঘাটে যান, তখন প্রেমিক কৃষ্ণ রাধার প্রতিটি পদচিহ্ন চুম্বন করতে থাকেন। এইভাবেই গোবিন্দ দাসের পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাধা কৃষ্ণ প্রেমের কথায় প্রেমিক কৃষ্ণের মাধুর্য রূপ ফুটে উঠেছে।

সুতরাং, আমরা বলতে পারি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে ঈশ্বর উপাসনার বিচিত্র প্রক্রিয়া রয়েছে। বৈষ্ণবদের মধ্যে সেই উপাসনার বৈচিত্র্য সর্বাধিক। সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে কেউ প্রভু, কেউ পুত্র, কেউ বন্ধু, কেউ কান্ত রূপে উপাসনা করেন। সেই জন্যই বৈষ্ণব দর্শনে রসের বৈচিত্র্য, কিন্তু সব কিছুরই মূলে আছে ভক্তি। বৈষ্ণব দর্শনে মধুর বা শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসের মধ্য দিয়েই কৃষ্ণের মাধুর্য রূপের প্রকাশ পেয়েছে। বৈষ্ণবদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবত্তার সার মাধুর্য রূপেই প্রকট। সার বলতে বোঝায় প্রাণ স্বরূপ অপরিহার্য বস্তু। যা কোন বস্তুর স্বরূপ, যার অভাবে সেই বস্তুর অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না, তাই সেই বস্তুর সার - তার পক্ষে অপরিহার্য।

“ভগবান আনন্দ স্বরূপ, রসস্বরূপ। এই আনন্দ বাদ দিলে তাঁহাতে আর কিছুই থাকে না। সুতরাং আনন্দ বা রসই হইল ভগবত্তার সার - অপরিহার্য বস্তু। আনন্দ বা রস যাহা মাধুর্যও তাহাই। সুতরাং মাধুর্যই ভগবত্তার সার।^{১১২}”

সেই জন্য বৈষ্ণব সাহিত্যে পদকর্তাগণ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রূপকেই নিজেদের ভক্তি এবং অবিচল বিশ্বাসের সঙ্গে সযত্নে তুলে ধরেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য মূলত একই স্বরূপ-শক্তির দুটি ভিন্ন প্রকাশ। ঐশ্বর্য আমাদের বিনম্র করে, সম্ভ্রম জাগায়; আর মাধুর্য আমাদের আকর্ষণ করে, আপন করে নেয়। বৈষ্ণব দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই যে, তা ঈশ্বরকে কেবল আকাশের কোনো দূরবর্তী বিচারক হিসেবে রাখেনি, বরং তাঁকে মানুষের কুটিরপ্রাঙ্গণে এক পরমাত্মীর আসনে বসিয়েছে। যে ঐশ্বর্য বিশ্বরূপের দাপটে অর্জুনকে ভীত করেছিল, সেই একই পরমাত্মা যখন যশোদার প্রেমে ধরা দিয়ে পরাস্ত হন, তখনই মাধুর্যের প্রকৃত বিজয় ঘোষিত হয়। মূলত, ঐশ্বর্যের কাঠিন্যকে ছাপিয়ে মাধুর্যের এই জয়গানই কৃষ্ণকথার শাস্ত্র আবেদন। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য রূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যচিন্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঐশ্বর্য ঈশ্বরত্বের বোধ জাগ্রত করে, মাধুর্য সেই বোধকে অতিক্রম করে প্রেমে পরিণত করে। বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষত বাংলা পদাবলীতে এই মাধুর্য ভাব সর্বাধিক বিকশিত হয়েছে। ভক্তির আলোকে কৃষ্ণ তাই কেবল দেবতা নন— তিনি প্রেমের চরম রূপ। ঐশ্বর্য তাঁর পরিচয়, কিন্তু মাধুর্য তাঁর হৃদয়। এই দ্বৈত রূপের সাহিত্যিক রূপায়ণই বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থায়ী মহিমা। কৃষ্ণের এই মানবিক ও প্রেমময় রূপটিই যুগ যুগ ধরে মানুষের হৃদয়ে ভক্তির চেয়ে ভালোবাসার আসনকে বেশি সুদৃঢ় করেছে। অর্থাৎ, বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা হল— ভগবানের ঐশ্বর্য মানুষকে মুগ্ধ করে ঠিকই, কিন্তু তাঁর মাধুর্যই মানুষকে মুক্তির স্বাদ দেয়। এই আনন্দ ও ভালোবাসাই হল কৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ।

Reference:

১. বসু, সুধা, *ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ*, সংস্কৃত বুক ডিপো প্রা: লি:, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ১২১
২. চট্টোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন, *কৃষ্ণথায় মালাধর ও মাধব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৩৪
৩. বসু, সুধা, *ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ*, সংস্কৃত বুক ডিপো প্রা: লি:, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ১২২
৪. তদেব, পৃ. ১২২

-
৫. গিরি, সত্যবতী, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ৩২
 ৬. তদেব, পৃ. ৩৪
 ৭. সেন, দীনেশ চন্দ্র, *বৈষ্ণব পদাবলী*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৪৮
 ৮. চট্টোপাধ্যায়, রবিরঞ্জন, *কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৩১
 ৯. জানা, শ্রীমন্ত কুমার, *বৈষ্ণব সাহিত্য সমীক্ষা*, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২১
 ১০. গিরি, সত্যবতী, *বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ*, দে'জ পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ১১৬
 ১১. চট্টোপাধ্যায়, তপনকুমার, *বৈষ্ণব পদ-সমীক্ষা*, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৫৬
 ১২. বসু, সুধা, *ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণঃ*, সংস্কৃত বুক ডিপো প্রা: লি:, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ১২৯